ইসলামিক ম্যানেজমেন্ট

নেসিউর জ্যাবনন

ভাষান্তর
মুহাম্মাদ ইফাত মান্নান

সম্পাদনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

ইসলামিক ম্যানেজমেন্ট
নেসিউর জ্যাবনন

অনুবাদ-স্বত্ব © সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

প্রথম বাংলা সংস্করণ
জুমাদাল উলা ১৪৪৩ হিজরি, ডিসেম্বর ২০২১

ISBN: 978-984-8046-14-2

নির্ধারিত মূল্য:
১৯০ টাকা মাত্র।

অনুবাদ-স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে পাইরেসিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড
২য় তলা, ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৭৫ ৩৩৪৪ ৮১১

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ১১
- মুখবন্ধ ১৫
- ভূমিকা ১৭

সংগঠন ও সংস্কৃতি

- সংঘবদ্ধতা ২৫
  - সংগঠন ও এর সংস্কৃতি: ২৮

পরিকল্পনা

- মিশন ৪৭
  - মূল উদ্দেশ্য (অবজেক্টিভ) ৫০
  - গোল: ৫৪
  - সহজসাধ্যতা: ৫৭
  - অংশগ্রহণমূলক ম্যানেজমেন্ট: ৬০
  - কাঠামোগত মোকাবিলা: ৬৩

  - পর্যায়ক্রমিকতা: ৬৭
  - বিকল্প পরিকল্পনা:.. ৭২
  - বাস্তবায়ন:.. ৭৬
  - আল্লাহর ওপর ভরসা:.. ৮২

সঙ্ঘবদ্ধ করা

- কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব ৮৯
  - কর্তৃত্ব ৮৯
  - দায়িত্ব: ৯২
  - কাজ ভাগ করে দেওয়া:.. ৯৪
  - নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া: ৯৮
  - মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো: ১০০

- ভৌগোলিক ডিপার্টমেন্টালাইজেশন: ১০০
  - কাজভিত্তিক ডিপার্টমেন্টালাইজেশন:.............................. ১০১
  - পণ্যভিত্তিক ডিপার্টমেন্টালাইজেশন:............................. ১০২
  - মিশ্র কাঠামো:..১০৩
  - প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর নানা দিক: ১০৩
  - বিশেষায়িতকরণ: ১০৪
  - নিয়ন্ত্রণ পরিধি:... ১০৪
  - বিধিবদ্ধতা: ১০৫
  - কেন্দ্রীয়করণ:.. ১০৫
  - জটিলতা: ১০৬
  - যান্ত্রিক বনাম অযান্ত্রিক কাঠামো: ১০৭
  - সারকথা:.. ১০৮

নেতৃত্ব

লিডারশিপ ১১৩

- নেতৃত্বের গুণাবলি: ১১৪
- নেতৃত্ব গঠন: ১১৮
- অনুপ্রেরণা: ১২০

মোটিভেশনের পথে পরিকল্পনা: ১২১

- পুরস্কার এবং শাস্তি: ১২৩
- আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা: ১২৭
- ন্যায্যতা: কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্যসুরক্ষা: ১৩০

প্রতিযোগিতা এবং বিরোধিতা

প্রতিযোগিতা ১৩৫

- ইতিবাচক প্রতিযোগিতা: ১৩৫
- নেতিবাচক প্রতিযোগিতা: ১৩৬
- ইতিবাচক বিরোধ: ১৪১
- নেতিবাচক বিরোধ: ১৪৫
- বিরোধের পরিণতি: ১৫০
- নেতিবাচক উপলব্ধি: ১৫২

বিরোধ নিরসন: ১৫৩

কেস স্টাডি

- উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর নেতৃত্ব ১৬১
  - পরিচয়: ১৬১
  - উমার ﵁-এর দায়িত্ববোধ: ১৬৮

- উমার ﵁ এবং অংশগ্রহণমূলক ম্যানেজমেন্ট: ১৬৮
  - উমার ﵁ এবং টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট: ১৬৯
  - উমার ﵁ এবং নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া: ১৭১
  - কেমন ছিল উমার ﵁-এর কন্ট্রোল প্রসেস? ১৭৩
  - উমার ﵁ এবং তার প্রশাসনিক উদ্ভাবনসমূহ: ১৭৫

সম্পাদকীয়

অফিস কালচারে 'ব্যাড গাই' বলে একটা কথা আছে। সাধারণত অফিসগুলোতে অপারেশন এবং ম্যানেজমেন্ট যারা দেখেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদেরকে এই ব্যাড গাই উপাধি পেতে হয়। বিশেষত যদি তিনি সত্যিই তার কাজে আন্তরিক হন। ম্যানেজমেন্টের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী লোককে মানুষ কেন 'ব্যাড গাই' মনে করে? কারণ ম্যানেজমেন্ট-এর অবধারিত একটা দিক হলো নিয়ন্ত্রণ, আর মানুষ স্বভাবতই অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পছন্দ করে না। প্রশ্ন হলো ম্যানেজমেন্টের বড় অংশ যদি নিয়ন্ত্রণই হয়, তাহলে বিষয়টাকে ম্যানেজমেন্ট না বলে 'কন্ট্রোল' আর 'ম্যানেজার' না বলে 'কন্ট্রোলার' কেন বলা হয় না? তা ছাড়া কন্ট্রোল আর ম্যানেজমেন্টের মধ্যে পার্থক্যই-বা কোথায়?

আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ হলো, ম্যানেজমেন্টে দক্ষতার প্রমাণ হলো এমনভাবে কন্ট্রোল করা, যেন যাদের কন্ট্রোল করা হয়েছে, তাদের মধ্যে কন্ট্রোল্ড হওয়ার নেতিবাচক অনুভূতি সৃষ্টি না হয়ে ইতিবাচক অনুভূতি সৃষ্টি হয়। তারা যেন উপলব্ধি করেন, এই কন্ট্রোল তাদের মেধাকে অবদমিত করার জন্য নয়, বিকশিত করার জন্য; তাদের স্বাধীনতাকে হরণ করার জন্য নয়, পরিশীলিত করার জন্য; তাদের অগ্রযাত্রাকে দমন করার জন্য নয়, সুসংহত করার জন্য; তাদের বিজয়কে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নয়, স্থায়ী করার জন্য।

লিডিং আর ম্যানেজমেন্টের মধ্যেও একই রকম একটা পার্থক্য আছে এবং কিছু বিষয়ে ওভারল্যাপিং আছে। একজন ম্যানেজারের মধ্যে যেমন কিছু মাত্রায় লিডারশিপ থাকা আবশ্যক, তেমনই একজন লিডারের মধ্যে কিছুমাত্রায় ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি থাকা আবশ্যক। কোনো ব্যক্তির মধ্যে এই দুটোর সংমিশ্রণ যত বেশি হয়, সাকসেসফুল স্টোরি তৈরির সম্ভাবনাও তত বাড়ে।

একজন লিডারের মূল কাজ হলো মানুষকে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করা, উদ্‌বুদ্ধ করা—কথা ও নিজের বাস্তব কাজের মাধ্যমে। তিনি যদি তাদেরকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ধাবিত হওয়ার ব্যাপারে কথা ও কাজের মাধ্যমে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করতে পারেন, তাহলে প্রাথমিকভাবে তিনি লিডার হিসেবে সাকসেস; কিন্তু কোনো কিছু অর্জন করার চেয়ে অর্জনকে ধরে রাখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, আর এখানে এসেই মূলত নেতার ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। ইতিহাসে অনেক জাগরণ সৃষ্টিকারী নেতাদের ক্ষেত্রেও এমন দেখা গেছে যে, তারা নেতা হিসেবে যতটা সফল, পরিচালক বা ম্যানেজার হিসেবে তার চেয়ে অনেক বেশি ব্যর্থ। আর তাই অনেক ইতিহাস সৃষ্টিকারী নেতার অন্তর্ধানে সেই জাতিই আবার খুশি হয়, যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এক সময় তারা প্রাণও বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিল।

তবে হ্যাঁ, সাকসেসফুল স্টোরি তৈরির সম্ভাবনা কেবল মাত্র লিডারের ওপর এককভাবে নির্ভর করে না; টিম মেম্বারদের ওপরেও অনেকাংশে নির্ভর করে। আলি রা.-কে কেউ একজন তার সময়কার বিশৃঙ্খল অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, উমার আবু বাক্‌রের সময় তো কোনো বিশৃঙ্খলা হয়নি, আপনার সময় এত বিশৃঙ্খলা কেন? তিনি বলেছিলেন, এর কারণ হলো, তাদের সময়ে ‘আমরা’ ছিলাম তাদের অনুসারী, আর আমার সময় ‘তোমরা’ হলে আমার অনুসারী। আলির সময়কার সেই অবস্থার মতো বর্তমান সময়কার ইসলামি সংগঠন ও ইসলাম দ্বারা অনুপ্রাণিত বাণিজ্যিক উদ্যোক্তাদেরকেও প্রায়ই একইরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়।

ধার্মিক আর অধার্মিকদের পরিচালনার ব্যাপারে আমার একটা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ আছে। পর্যবেক্ষণটি হলো, যারা বিধর্মী, সেক্যুলার কিংবা ধর্ম পালনের ব্যাপারে সিরিয়াস নয়, তাদের পরিচালনা করা ও তাদের আনুগত্য লাভ বেশ সহজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্যের ব্যাপারটা বৈষয়িক সুবিধা প্রাপ্তির সমানুপাতিক হয়। আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের মাত্রা কম থাকায় তারা অনেকে মনে করে কাজই রিজিক দেয়, এ কারণে কাজের প্রতি তাদের মনোযোগ বেশি থাকে, নিয়োগদাতাদের রিজিকদাতা টাইপকিছু মনে করার কারণে তাদের প্রতি তাদের আনুগত্যের মাত্রা প্রবল থাকে। সাময়িক বিচারে ব্যাপারটিকে বেশ ভালো মনে হলেও আল্টিমেটলি এটা ভালো নয়। কারণ, এই মেরুদণ্ডহীন লোকদের কারণেই

পৃথিবীর সকল স্বৈরাচার, মাফিয়া গ্যাং লিডার, সকল অনাচারী এস্টাবলিশমেন্ট টিকে থাকে। অর্থের বিনিময়ে এদের দিয়ে অন্যায়, অনৈতিক ও নিকৃষ্ট কাজ করানো যায়। আর তারা তাদের সকল কুকর্মকে জায়েজ করার জন্য বলে 'আমরা কী করব, আমরা তো চাকুরি করি, আমাদের কোনো দোষ নেই, আমাদেরকে ওপরের নির্দেশ পালন করতে হয়'। যে ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে জেনেশুনে কোনো অন্যায় নির্দেশ পালনে সম্মত হয়, সে বস্তুগত শিক্ষায় যতই শিক্ষিত হোক না কেন, সে মানুষের কায়ায় অমানুষ, সে এই সমাজের সবচেয়ে অসভ্য আর ইতর শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এই মেরুদণ্ডহীন ইতরদের ব্যবহার করেই স্বৈরাচার, মাফিয়া ও অনাচারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্যাটানিক ডায়নাস্টি টিকিয়ে রাখে।

পক্ষান্তরে যারা ধর্মের ব্যাপারে সচেতন, তাদের মধ্যে ন্যায় অন্যায়ের একটা বোধ প্রখর থাকে। তাদের দিয়ে অন্যায়, অনৈতিক ও হারাম কাজ করানো যায় না। এরা সমাজের জন্য আল্টিমেটলি ক্ষতিকর নয়; কিন্তু এই ধর্মবোধটা যদি সকল কোণ ও মাত্রায় ব্যালান্সড না হয়, তবে তাদের অনেকের মধ্যেই কাজের প্রতি অমনোযোগিতা ও অলসতা দেখা যায়। যে ধর্মের কারণে তাদের আরও অধিক মাত্রায় কর্মঠ ও কর্মপরায়ণ হওয়ার কথা ছিল, সেই ধর্মের খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ বুঝ তাদের মধ্যে এমন বিপরীত আচরণ তৈরি করে। যেসব ক্ষেত্রে আনুগত্যই ছিল ধর্মের দাবি, সেগুলোকেই তারা ধর্মের বিপরীতে দাঁড় করায়। নিজ মতের সঙ্গে না মিললেই প্রতিষ্ঠানের কথা শোনাকে তারা তাকওয়ার বিপরীত বলে সাব্যস্ত করে। তারা চায় ধর্মীয় বিধিবিধানের বিস্তারিত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রতিটি লম্ব ও কোণে প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে তার সঙ্গে একমত পোষণ করতে হবে... ইত্যাদি।

রাজনৈতিক নিপীড়ন, হয়রানি ও নানারকম প্রতিকূলতা সামলে যখন প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক কষ্টে সততার প্রতি নিজেদের কমিটমেন্ট বজায় রেখে সামনে বাড়তে চেষ্টা করে, তখন গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো এসব ব্যাপার এক মানসিক অশান্তি ও অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর সামনে এগুনোর পথে এগুলো হয়ে দাঁড়ায় এক জটিল বাধা। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমদের মধ্যে এই মতপার্থক্য, অনৈক্য, অমিল যেন তার প্রান্ত ছুঁয়ে গেছে। এদেশে বড় কোনো সত্যিকার ইসলামি কিংবা ইসলামবান্ধব প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠার পেছনে এটাও একটা অন্যতম কারণ। আমি আশা করতে চাই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কম্যুনিটি

কাঙ্ক্ষিত ম্যাচিউরিটি লাভ করে এসব দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবে এবং সামনে এগিয়ে যাবে।

সাইয়েদ কুতুব শহিদ তার তাফসির ‘ফী যিলালিল কুরআনে’ সূরা আনফালের তাফসির করতে গিয়ে গনিমত ভাগ-বাটোয়ারার ফিক্‌হ নিয়ে আলোচনাতে কিছুটা অনাগ্রহ দেখিয়েছিলেন; যতদূর মনে পড়ে এমন কিছু বলেছিলেন যে, আগে গনিমত প্রাপ্তির উপায় নিয়ে আলোচনা হোক, গনিমত অর্জিত হোক, তারপর ভাগ-বাটোয়ারার আলোচনা করা যাবে। সালাফদের ফিক্‌হের কিতাবে এগুলো তো সব বলাই আছে। আমার মনে হয় মুসলিমদের এখন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে অধিক পরিমাণ অধ্যয়নের সময় হয়েছে। হয়তো খুব শীঘ্রই তারা গোটা পৃথিবীকে আবার নেতৃত্ব দেবে ইনশাআল্লাহ। ম্যানেজমেন্ট খুবই গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হবে তাদের জন্য। আল্লাহ সেই দিনগুলো দ্রুত নিয়ে আসুন, তার আগে আমাদেরও যোগ্য করে তুলুন—এই কামনায়।

আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক
প্রধান সম্পাদক, সিয়ান পাবলিকেশন

মুখবন্ধ

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষ ইসলামের অনুসরণ করছে। আক্ষরিক অর্থে ‘ইসলাম’ মানে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতাগুলোর মাঝে ইসলাম এক অন্যতম অধ্যায়ের নাম। শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানচর্চায় ইসলাম একক সভ্যতা হিসেবে অনেক ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

ইসলামের শিক্ষাগুলো স্বভাবতই এমন যে, তা মানুষকে সবরকম মন্দ এবং সকল প্রকার ক্ষতি থেকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করবে। একইসঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন চাহিদাগুলো স্রষ্টার দেওয়া উপকরণের সাহায্যে সবচেয়ে কার্যকর উপায়ে পূরণ করার চেষ্টা করবে। আর এ উদ্দেশ্যগুলো অর্জিত হবে ইসলামের শাশ্বত আদর্শের সীমারেখার মাঝে—ন্যায়বিচার, সাম্য এবং দয়া। ইসলাম আমাদের চমৎকার এক জীবনদর্শন আর জীবনযাপনের এক অনিন্দ্যসুন্দর রূপরেখা দিয়েছে।

ইসলামের এই দিকগুলো মাথায় রেখে লেখক ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করতে চেষ্টা করেছেন; তবে এই প্রচেষ্টায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন ইসলামের চিরাচরিত বিধিবিধান, সারকথা আর মূলনীতিকে ধারণ করেই। এই বইয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি, বিরোধ মিমাংসা ইত্যাদি নিয়ে জরুরি সব কথা আছে। অনেক পরিকল্পনা একসঙ্গে বস্তবায়নের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণের ধারা এই লেখাকে আরও জোরদার করেছে। দীর্ঘস্থায়ী উদ্দেশ্যসমূহ আর প্রাতিষ্ঠানিক কর্মপরিকল্পনার মধ্যকার সমন্বয়ের ব্যাপারে আরেকটা বেশ চমৎকার বিষয়ও এই বইয়ে দেখানো হয়েছে। দেখানো হয়েছে পরিকল্পনা আর কৌশলের সমন্বয় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে কীভাবে সরাসরি যুক্ত।

নেতৃত্ব দেওয়াকে দেখানো হয়েছে মানুষের সেবা হিসেবে। স্বীকৃতি এবং নিয়মতান্ত্রিক শাস্তিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে ব্যক্তির অন্তর্গত অনুপ্রেরণার সঙ্গে। কর্মক্ষেত্রে ন্যায়বিচার আর সাম্যের ধারণাও এই বইয়ে যথাযথ স্থান পেয়েছে। পুরো বই জুড়ে লেখক তার উপস্থাপিত ধারণাগুলোর মডেলও সামনে নিয়ে এসেছেন। ইসলাম একদিক থেকে বিরোধকে মেনে নেয় ‘চেক এবং ব্যালেন্সের’ অংশ হিসেবে; তবে এই বিরোধ যেন কেবল বিরোধের খাতিরেই বিরোধে সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং বিরোধের কারণগুলোর অনুসন্ধান, পরিণতি আর সেই বিরোধের মীমাংসাসংক্রান্ত আলোচনাও যেন উৎসাহ পায়—সে ব্যাপারটিও উঠে এসেছে। আর সামগ্রিক কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এই বইয়ের আরও অনেক উদ্যোগের যে সম্পর্ক রয়েছে, সেটাও চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

মোটকথা, এটা যথার্থ একটা বই। যেখানে ম্যানেজমেন্ট এবং ইসলাম উভয়ের মৌলিক ধারণা এবং পদ্ধতিগুলোর মিশেল ঘটেছে। এমন দুইটি শক্তি—যা পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সম্পর্কের ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছে।

ড. ডেভিড আই ক্লিল্যান্ড

আর্নেস্ট ই, রথ অধ্যাপক এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রফেসর
স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং
পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়
জুলাই ১৯৯৪

ভূমিকা

প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্যের মূল হলো কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট। মজার একটা ব্যাপার হলো, যখনই নির্দিষ্ট কোনো ম্যানেজমেন্ট-পদ্ধতি কার্যকারিতা দেখায়, অসংখ্য মানুষ সেটা শিখতে শুরু করে। উদাহরণস্বরূপ: পৃথিবীজুড়ে বহু ম্যানেজার জাপানিজ কোম্পানিগুলোর সাফল্যের কারণে জাপানিজ ম্যানেজমেন্ট শেখার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। ইতিহাসে ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারা একটি অন্যটিকে সরিয়ে ম্যানেজমেন্ট-পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। এই বইয়ে আমি তুলনামূলকভাবে কিছুটা অপরিচিত একটা ম্যানেজমেন্ট ধারার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবো। ম্যানেজমেন্টের এই ধারাটি তার সামসময়িক সব ধারাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, আর অগণিত গবেষক, নেতা আর ম্যানেজারদের চিন্তাচেতনায় অভাবনীয় ছাপ ফেলেছিল। প্রথম যুগের মুসলিমরা খুব দ্রুত সফলতা পেয়েছিলেন, আর সে সাফল্যের প্রভাব শত শত বছর পর এখনও বিশ্বজুড়ে বিরাজমান। এই অভাবনীয় ঐতিহাসিক সাফল্যই মাইকেল হার্টকে প্রেরণা দিয়েছে নবি মুহাম্মাদﷺ-কে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের তালিকায় সবার ওপরে স্থান দিতে।

এই বইয়ে ম্যানেজমেন্টকে উপস্থাপন করা হয়েছে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে, একইসঙ্গে ইসলামে ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাও তুলে ধরা হয়েছে। কিছু পাঠক জানতে চাইতে পারেন,

- ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা আসলে কী?
- আর এখন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমরা যা পড়ি, তা থেকে এই ম্যানেজমেন্ট পাঠের ভিন্নতাটা কোথায়?

- এখনকার ম্যানেজমেন্ট পঠনে কি কোনো সমস্যা আছে?
- আর ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ম্যানেজমেন্ট পাঠে আমরা নতুন কী পাব?

এই সব প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে যা কিছু বলা যায়, তার সারকথা হলো, ইসলামি ম্যানেজমেন্টের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে অন্যান্য ম্যানেজমেন্ট ধারার মৌলিক পার্থক্য হলো, এই ধারায় ম্যানেজমেন্টের গোটা ধারণাটাকে আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে ধারণ করা হয়। এই সংযুক্তিটি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং সমাজের সামগ্রিক কাজকারবার এবং মেলামেশায় বেশ পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। ইসলামি ম্যানেজমেন্টে নৈতিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক যুগের ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞরা ইসলামি জ্ঞানের বিশাল ভান্ডারকে প্রায় সম্পূর্ণটাই এড়িয়ে যায়। ঐশী বাণীর ধারণায় এর বিশুদ্ধতা আর নিপুণতায় বিশ্বাস আমাদের তাড়িত করে একে জ্ঞানের এক মহান উৎস হিসেবে মেনে নিতে। কুরআন তার মহত্ত্বের ঘোষণা দিয়ে বলেছে,

» নিশ্চয় তা সম্মানিত কুরআন। [সূরা ওয়াকিয়াহ: ৭৭]

কুরআন এমন একটা গ্রন্থ, যা নিয়ত মানুষকে পথ দেখাতে থাকে। স্থান-কালের গণ্ডি পেরিয়ে মানব সম্প্রদায়কে এক অভিন্ন জ্ঞান আর চিন্তাকাঠামো প্রদান করে। কুরআনের প্রতিটি বাক্যকে বলা হয় আয়াত, যার অনুবাদ করা হয় সাধারণত—চরণ বা স্তবক; কিন্তু এর প্রকৃত মানে হলো 'নিদর্শন', যা নির্দেশ করে। কুরআন অনেকগুলো নিদর্শন সংবলিত গ্রন্থ; যা ইঙ্গিত করে, প্রমাণ দেখায় এক ও অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের। তাই স্রষ্টায় বিশ্বাসের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো কুরআনকে নিজেদের জ্ঞানচর্চার মূল উৎসের অন্তর্ভুক্ত করা। এই অন্তর্ভুক্তি ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত জ্ঞানচর্চায় একটা বিপ্লব বয়ে আনতে পারে। পরকালে বিশ্বাস আমাদের কায়কারবারে এক গভীর দায়বদ্ধতাও এনে দেবে। আর এই দায়বদ্ধতা আবার মুসলিমদের আচার-আচরণে আত্মনিয়ন্ত্রণের মাত্রাও বাড়িয়ে দেবে।

অন্যদিকে এখনকার ম্যানেজমেন্ট ধারাগুলোর অবদানও অনেক, যদিও এর অধিকাংশই গবেষণালব্ধ, নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের ভিতরে যা আবার সীমাবদ্ধ। এসব গবেষণার ফলাফল বিশ্বজনীন না; বরং গবেষণার এলাকাতেই কেবল প্রযোজ্য। সাংস্কৃতিক এই ভিন্নতা ম্যানেজমেন্টের ধরণ-ধারণেও বিভিন্নতা এনেছে। আবার সামসময়িক কিছু ম্যানেজমেন্ট ধারার পটভূমি মুসলিম মননের কাছে একেবারেই অপরিচিত। এজন্য যেসব ম্যানেজমেন্ট ধারা ইসলামি শিক্ষার

সঙ্গে সাংঘর্ষিক সেসবের সংখ্যা খুব বেশি নয়; একইসঙ্গে সেগুলো অনেক পশ্চিমা বিশেষজ্ঞদের কাছেও ক্ষেত্র বিশেষে বিতর্কিত। এর মানে দাঁড়ায়, ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ম্যানেজমেন্টকে গবেষণা করা হলে তা পুরোনো দুয়ার বন্ধ করার চাইতে আরও বেশি নতুন দুয়ার খুলে দেবে।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত পড়াশোনায় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলো, আমরা ঠিক কোন উৎস থেকে তথ্য আহরণ করব। অনেক লেখক বলেছেন, এই তথ্যগুলো আমরা পাব ইসলামি আইনশাস্ত্রে তথা ইসলামি ফিক্‌হে; কিন্তু এটা সম্পূর্ণ সঠিক নয়, যদিও ওয়াহির জ্ঞান ইসলামি আইনশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বটে। কারণ, আইনশাস্ত্রের প্রকৃতিই হলো এই যে, তা সবকিছুকে কেবল আইনি দৃষ্টিতে দেখে থাকে; এটাই এই শাস্ত্রের প্রকৃতি। অথচ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ভিন্ন। কারণ ম্যানেজমেন্টের মাথাব্যথা কোনটা হালাল কোনটা হারাম সেটা নিয়ে নয়; বরং এর গোড়ার কথা হলো আমাদের প্রতিদিনকার সমস্যাবলির কার্যকর সমাধান-পদ্ধতি খুঁজে বের করা, আর আল্লাহ যে নিয়ামাত মানুষকে দিয়েছেন তার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। আরেকটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, ইসলামের অন্যান্য মৌলিক বিষয়ের মতো ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতির ব্যাপারে সবার একমত হওয়াটা আবশ্যক কিছু না, আর সবার জন্য এটা মেনে চলার বাধ্যবাধকতাও নেই। আল-বুরাই তার গ্রন্থ *ইসলামে ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন ব্যবস্থা*তে পুরো একটা অধ্যায় লিখেছেন ইসলামি প্রশাসন ব্যবস্থার উৎস নিয়ে। তিনি ইসলামি প্রশাসন ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে কুরআন, নবিজির প্রশাসন আর তাঁর চার খলিফার প্রশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ছাড়া উমার এবং আলি رضي الله عنه-এর পক্ষ থেকে তাদের গভর্নরের উদ্দেশে লিখিত কিছু পত্রকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইসলামি প্রশাসন ব্যবস্থার ভিত্তিকে আরও বর্ধিত করতে গিয়ে তিনি ইসলামি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ এবং আলিমদের লিখনিকেও সংযুক্ত করেছেন। তবে এক্ষেত্রে এই সংযুক্তিতে তিনি পূর্বের লেখকদের ত্রুটি পুনরাবৃত্তি করেননি। কারণ সহজ কথায় তিনি নিজেকে আইনশাস্ত্রের গণ্ডিতে বেঁধে ফেলতে চাননি।

ইসলামের শিক্ষা মানুষকে এই জীবনে সফলতার জন্য প্রয়োজনীয় সব দিকনির্দেশনাই যথাযথভাবে দেয়—এই নিগূঢ় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে বইটি। অন্য কথায়, ইসলাম আমাদের যে নির্দেশনা দিয়েছে তা একেবারেই নিখুঁত।

এর যথাযথ প্রয়োগ এই জীবনে এবং পরকালেও আমাদের সাফল্য এনে দেবে। ইসলামের শিক্ষাকে যদি আমরা একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা হিসেবে দেখি, তবে সেখান থেকে আমরা কিছু ম্যানেজারিয়াল শিক্ষাও আহরণ করতে পারি। ইসলামি শিক্ষাগুলো যেভাবে কাঠামোবদ্ধ রূপ পেয়েছে, সেই পদ্ধতির মধ্যে থেকেও আমরা ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কিছু ধারণা উদ্ধার করেছি। ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের আরেকটি উৎস হলো কুরআন এবং নবিজির সুন্নাহ। এ ছাড়া অন্যান্য উৎসগুলোর মধ্যে আরও রয়েছে নবিজি এবং তাঁর খলিফাদের নেতৃত্বদান পদ্ধতি, মুসলিম এবং অমুসলিম বিশেষজ্ঞদের লিখনি—যাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অবদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার ফলশ্রুতিতে মানুষের আচরণগত অনেক বিষয়-আশয়ও আমরা বুঝতে পারছি। এই বিষয়গুলো এমন যার পঠন-পাঠনের ওপর আল্লাহ নিজেই গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা কোনোভাবেই এই লেখার উপকরণ খুঁজতে গিয়ে কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির লেখক অথবা নির্দিষ্ট কোনো প্রজন্মে সীমাবদ্ধ থাকিনি। জ্ঞান এবং প্রজ্ঞা পুরো পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে আছে। আর তাই ততক্ষণ পর্যন্ত এই জ্ঞানানুসন্ধান আমরা চালিয়ে যাব, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই জ্ঞানকে মূল্যায়ন করার এবং এর প্রাসঙ্গিকতা বুঝবার মতো বিশ্লেষণী দক্ষতা আমাদের মাঝে আছে। নবিজি বলেছেন,

> » প্রজ্ঞা যেখানেই থাকুক না কেন, মুসলিম তার খোঁজ করবে। কেননা প্রজ্ঞার ওপর মুসলিমের হক সবার চেয়ে বেশি। [ইবনু মাজাহ]

ওপরে উল্লিখিত ধারণাগুলোর ওপর ভিত্তি করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং অকৃত্রিম ম্যানেজারিয়াল বিষয়াদি এই বইয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানকার মৌলিক বিষয়াদিসমূহ মূলত পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ এবং অনুপ্রেরণা প্রদান নির্ভর। এসব জায়গাগুলোতে কিছু নতুন মডেল তুলে ধরা হয়েছে, যা ম্যানেজারিয়াল দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য বেশ শক্তিশালী কিছু কৌশল আমাদের দিতে পারে। অন্যান্য টপিকগুলো মূলত সংগঠন এবং বিরোধ নিষ্পত্তি (কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট) নিয়ে, যা ম্যানেজারদের অসংখ্য নতুন নতুন আইডিয়াও দিয়ে থাকে। বিরোধ মীমাংসা নিয়ে এখানে যা যা তুলে ধরা হয়েছে, তা মূলত এটাই তুলে ধরে যে, ইসলাম ইতিবাচক বিরোধকে এক ধরনের 'চেক এন্ড ব্যালেন্স' প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উৎসাহিত করে। এই বইয়ের একটা দীর্ঘ চ্যাপ্টার রচিত হয়েছে সাংগঠনিক সংস্কৃতি নিয়ে আর যথাযথ কার্যকারিতা অর্জনে এর প্রয়োগের গুরুত্ব তুলে ধরতে। নবিজির

১

সংগঠন ও সংস্কৃতি

সংঘবদ্ধতা

ইসলাম সমগ্র মানবতার জন্য প্রেরিত এক বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা। আর তাই এটি নির্দিষ্ট কোনো জাতি, গোত্র বর্ণ কিংবা লিঙ্গে সীমাবদ্ধ না। তা ছাড়া স্বভাবগতভাবেই মানুষ সামাজিক জীব। টিকে থাকার জন্য মানুষের পরস্পরের সাহায্য-সহযোগিতা ভীষণ প্রয়োজন। ইসলাম এই ব্যাপারটায় গুরুত্বারোপ করে একইসঙ্গে সংঘবদ্ধতার ধারণাকেও জরুরি মনে করে। আরও উল্লেখ্য যে, স্বাভাবিক পরিবেশে একা একা ইসলাম চর্চা করাটাও মূলত অনৈসলামি একটা ব্যাপার। ইসলাম তো সামাজিক ধর্ম। কুরআনে কোনো কোনো জায়গায় সব মুসলিমকে একসঙ্গে আহ্বান করা হয়েছে আবার কোথাও কোথাও সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। কুরআনের পাতা খুলে দেখবেন 'হে বিশ্বাসীরা' অথবা 'হে মানবজাতি'-এর বারংবার উল্লেখ।

ইসলাম তার অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকতে বলে, আর বিভক্তির ব্যাপারে সাবধান করে।

> » আর দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরো আল্লাহর রজ্জুকে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না... [সূরা আলে ইমরান: ১০৩]

মুসলিমদের একসঙ্গে কাজ করা উচিত। কারণ সম্মিলিত প্রচেষ্টা একক প্রচেষ্টার চেয়ে বহুগুণে উত্তম।

> » আল্লাহর হাত জামাআতের ওপর আছে। [তিরমিযি]

আবার, সম্মিলিত কাজের উদ্দেশ্যও হওয়া চাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। নয়তো সম্মিলিতভাবে কাজ করার যে মূল উদ্দেশ্য সেটাই ব্যহত হবে। আল্লাহ মুসলিমদের সংঘবদ্ধ হওয়ার, জামাআতবদ্ধ হওয়ার আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে এই

সংঘবদ্ধতার মূল লক্ষ্যটিকেও চিহ্নিত করে দিয়েছেন—কল্যাণের দিকে ডাকা, ভালোর পথে আহ্বান আর মন্দের পথে নিষেধ।

> » আর তোমাদের মধ্য থেকেই হোক এমন একটা দল, যারা আহ্বান করে কল্যাণের দিকে, ভালো কাজের আদেশ করে আর মন্দ কাজে নিষেধ করে। এরাই তো সফলকাম। [সূরা আলে ইমরান: ১০৪]

স্টোনার এবং ফ্রিম্যানের [১] মতে যখন দুই বা ততোধিক মানুষ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কোনো একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য একসঙ্গে কাজ করে, তখন তাকে সংগঠন বলা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর খ্যাতিমান মনীষী ইমাম কুরতুবি তার কুরআনের তাফসির *আল-কুরতুবিতে*[২] বলেছেন, উম্মাহ বা সংগঠন হলো এমন একটা দল, যারা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী। আল-কিলানি[৩] সে দলকে উম্মাহ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, যাদের একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা মিশন আছে। আর উদ্দেশ্যবিহীন কোনো দলকে তিনি উম্মাহর সংজ্ঞা বহির্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন।

ড্যাফট[৪] বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক মিলে যদি একই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করে, তবে তাকে সংগঠন বলা হবে। মোরহেড আর গ্রিফিন[৫] লক্ষ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলছেন,

> একটা সংগঠন তার অস্তিত্বের মানে খুঁজে পায় তার উদ্দেশ্যের মাঝে। এটা একেবারে সরাসরি এই প্রশ্নের উত্তরটাই দেয়, তুমি কী করছ আসলে বলো তো?

এখন আমরা এই উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পারি যে, খোদ সংগঠন বা সংঘবদ্ধতাটা মূল বিষয় নয়; বরং আসল কথা হলো লক্ষ্য থাকা। আর সম্মিলিত কাজটা হলো সেই লক্ষ্য অর্জনের একটা উপায় শুধু। আমাদের চারপাশে বহু উপকরণ এবং প্রতিভা এলোমেলো ছড়িয়ে থাকে। সংগঠন এই বিক্ষিপ্ত সব উপকরণ এবং প্রতিভাগুলোকে এক ছাদের নিচে জড়ো করে। যা আদতে নিজে থেকে কখনও

---

[১] স্টোনার এন্ড ফ্রিম্যান, ম্যানেজমেন্ট, ৫ম সংস্করণ, প্রেন্টিস হল, নিউ জার্সি (১৯৯২)

[২]আত-তাফসির খণ্ড ২ পৃ. ১২৭

[৩] আল-কিলানি, ইখরাজ আল উম্মা আল মুসলিমা পৃ. ১১৭, দার আল-উম্মা, কাতার (১৯৯১)

[৪] ড্যাফট, রিচার্ড, অর্গানাইজেশন থিওরি এন্ড ডিজাইন ২য় সংস্করণ (সেন্ট পল ওয়েস্ট, ১৯৮৬), পৃ. ৯

[৫] মোরহেড, জি এন্ড গ্রিফিন আর.ডাব্লিউ., অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার, ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৫২

হয়ে উঠত না।

গিবসন, ইভানসেভিচ এবং ডনেলির[৬] মতে,

> সংগঠন এসেছে মূলত একটা কারণেই—সংগঠন সেটা করতে পারে, যা আমরা ব্যক্তিগতভাবে করতে পারি না। কাজেই হোক সে লক্ষ্যটা ভালো কিছু লাভ করা, শিক্ষাপ্রদান করা, ধর্মের সেবা করা, স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করা, একজন মানব ও একজন মানবীকে চাঁদে পাঠানো, কাউকে নির্বাচিত করা অথবা একটা স্টেডিয়াম বানানো, সংগঠনই সেসব করে। কোনো সংগঠনকে তাদের লক্ষ্যমুখী আচরণ দেখে চিহ্নিত করা যায়। একটা সংগঠন যে লক্ষ্য এবং কার্যবিধি সম্পন্ন করে, সেটা অবশ্য আরও কার্যকরভাবে করা সম্ভব হতো ব্যক্তিগত এবং দলগত সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে।

একদিকে সংগঠন গড়ে তোলা হয় কিছু লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং সংগঠনে একসঙ্গে অনেক মানুষ কাজ করে। অন্যদিকে একটা সংগঠন তার অভ্যন্তরে কর্মরত মানুষগুলোর আচরণ এবং তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাতে বেশ ভালো প্রভাব রাখে। কারণ সংগঠনের ভিতরে একটা নির্দিষ্ট পরিবেশে তারা বহু দিন ধরে কাজ করে থাকে। এই নির্দিষ্ট আবহই পরবর্তী সময়ে তাদের চিন্তাধারার গতিপথ তৈরি করে দেয়।[৭]

বিভিন্ন সংগঠন থেকে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। আজকে আমরা চমৎকার যেসব পণ্য এবং সেবা পাচ্ছি, এ সবই বিভিন্ন সংগঠনের কাজের ফসল। শিক্ষা, যোগাযোগব্যবস্থা, খাবার, পোশাক, বাসস্থান এবং বিনোদন সবই সংগঠন থেকে পাওয়া। নিত্যদিন যে আরামদায়ক জীবন আমরা উপভোগ করছি, সংগঠন ব্যতীত এসব সম্ভব হতো না। মানুষ যত সংগঠিত হবে, একটা দেশ তত উন্নত হবে। এটা অনেকটা অংশীদারিত্ব অর্থায়নের মতো, যেটা জার্মানিকে অর্থনৈতিকভাবে অনেক অগ্রগতি এনে দিয়েছিল। অন্যদিকে এমন সংগঠনও ছিল, যাদের দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছি। এই সংগঠনগুলোর কোনোটি ফ্যাসিবাদি ধরনের, কোনোটা

---

[৬] গিবসন, ইভানেভিচ এন্ড ডেনলি, অর্গানাইজেশনস বিজনেস পাবলিকেশন ইনক. পৃ. ৭ (১৯৮৫

[৭] উরউইক, দ্যাট ওয়ার্ড অর্গানাইজেশন, অ্যাকাডেমি অব ম্যানেজমেন্ট রিভিউ, পৃ. ৮৯-৯১, জানুয়ারি (১৯৭৬)

বর্ণবাদী আবার কোনো কোনোটি মাদক এবং এ জাতীয় অনেক অন্যায় কাজের সঙ্গে জড়িত। মন্দ কাজে একসঙ্গে হওয়াকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। একে অন্যকে সাহায্য করতে হবে কেবল ভালো কাজে। আল্লাহ বলেন,

> » ভালো এবং সৎ কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করো। গুনাহ এবং সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অন্যকে সাহায্য করো না। আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহ শাস্তি দানে অনেক কঠোর। [সূরা মায়েদা: ০২]

নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগঠনগুলোর নির্দিষ্ট কিছু কর্মপরিকল্পনা থাকা উচিত। এ ছাড়া এই পরিকল্পনাগুলো সার্থক করতে প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ নানা প্রক্রিয়া এবং কিছু কর্তৃত্বের সম্পর্ক। যেকোনো সম্মিলিত প্রচেষ্টার ভিত্তি হলো কর্তৃত্ব, দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা। তবে যেকোনো সংগঠনের মূল ভিত্তি হলো এর মধ্যকার সংস্কৃতি। আর এই সাংগঠনিক সংস্কৃতি নিয়েই আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব।

সংগঠন ও এর সংস্কৃতি:

সাংগঠনিক সংস্কৃতি বলতে আমরা কী বুঝি, সংগঠন ঠিকভাবে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আর সংগঠনের ভিতরে একটা সাংস্কৃতিক পরিচিতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একজন নেতার ভূমিকা—এ সব বিষয় নিয়ে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে। এরপর আমরা উদাহরণ হিসেবে নবিজির সাহাবিদের মধ্যকার সংস্কৃতি কেমন ছিল, সে ব্যাপারটা আলোকপাত করব।

একটা সংগঠনে বিভিন্ন রকম মানুষ থাকে। আপন গুণাবলিতে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। আর এই স্বাতন্ত্র্য এমনকি সংগঠনের বাহ্যিক আবহেও ফুটে ওঠে।[৮] সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি একই রকম মূল্যবোধ এবং বিশ্বাসের সমন্বয়, যা থেকে গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট কিছু আচার-ব্যবস্থা।[৯] সাংগঠনিক পরিমণ্ডল এবং সংস্কৃতি নিয়ে অনেক গবেষণা-মূলক লেখাজোকা আছে বটে, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত; কিন্তু এ সংক্রান্ত আলোচনা মানুষের কাছে বেশি ছড়িয়েছে জাপানি কোম্পানিগুলোর

---

[৮] ব্যারন, আর. এ., গ্রিনবার্গ, জে. বিহেভিয়ার ইন অর্গানাইজেশনস, অ্যালিন এন্ড বেকন, পৃ. ২৯৭, বোস্টন (১৯৮৯)

[৯] লিন্ডা স্মারচিচ, কনসেপ্টস অব কালচার এন্ড অর্গানাইজেশনাল এনালাইসিস, এডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্স কোয়ার্টারলি, পৃ.৩৪২, সেপ্টেম্বর (১৯৮৩)

উমার ﵁-এর নেতৃত্বের ধরন

উমার ﵁-এর দায়িত্ববোধ:

দায়িত্ববোধের বিচারে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁। তিনি এভাবে ভাবতেন—তার অধীনে থাকা সবকিছুর জন্য এমনকি পশুপাখির জন্যও তিনি আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ। একবার আলি ﵁ উমারকে তাড়াহুড়ো করে কোথাও যেতে দেখলেন। আলি ﵁ জিজ্ঞেস করলেন তিনি কোথায় যাচ্ছেন। উমার ﵁ জবাবে বললেন, সদকার একটি উট দলছুট হয়ে গিয়েছিল, তাই সেটিকে ধরতে যাচ্ছেন। আলি ﵁ বললেন, এটা কিন্তু একটু বেশিই হচ্ছে! মানে উমার ﵁-এর পরবর্তী সময়ের মুসলিমদের জন্য খুব উঁচু দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছেন। এত উঁচু ঈমানি দায়বদ্ধতা সবাই বজায় রাখতে পারবে না। উমার ﵁ জবাবে বললেন, যদি একটা ছাগলও ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর তীরে হারিয়ে যায় সেজন্যও আমি হাশরের দিন দায়বদ্ধ থাকব। তিনি জনগণের হালচাল জানার জন্য নিজের দরজা সব সময় খোলা রাখতেন। সাধারণ জনগণের খোঁজখবর নিতেন, কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কখনও অনানুষ্ঠানিকভাবে। ছদ্মবেশে তিনি ঘুরে বেড়াতেন মাদীনার অলিগলি। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনগণের জীবন সত্যিকার অর্থেই কীভাবে কাটছে।

উমার ﵁ এবং অংশগ্রহণমূলক ম্যানেজমেন্ট:

অংশগ্রহণমূলক ম্যানেজমেন্ট হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণে সবার অংশগ্রহণ। এটা যতটা না প্রোগ্রাম তারচেয়ে বেশি বরং সংস্কৃতি। এই অংশগ্রহণটা ইসলামে বাধ্যতামূলক। পরামর্শ দেওয়া-নেওয়া, বেঠিককে ঠিক করা এবং উপদেশ দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে এই অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। অংশগ্রহণ তাই নবিজি ﷺ এবং তাঁর সাহাবাদের সময়ে বরং একটা কালচারের মতই ছিল। যদিও এই অংশগ্রহণের চর্চা ইসলামের ইতিহাসে একেক সময় একেক রকম ছিল, তবু এর চর্চা ছিল। উমারকে রীতিমতো অংশগ্রহণমূলক ম্যানেজমেন্টের গুরু ধরা হয়। সাহাবারা কিন্তু নিজেদের মধ্যে অংশগ্রহণমূলক ম্যানেজমেন্ট চর্চা করতেন। এটা তাদের শেখানো কিংবা এর জন্য আহ্বান করা কোনোটারই প্রয়োজন হয়নি। উমার ﵁

পুরোপুরি বাদ পড়ে গেছে। এটা কিন্তু রীতিমতো অবাক করা একটা ব্যাপার। কারণ এখনকার সময়ে সাংস্কৃতিক দিকটাকে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যেভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত দেখানো হচ্ছে, এটা বাদ পড়াটা যেন রূপকথার মতো। সমাজের ভিতর যে সুপ্ত মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং বিশ্বজনীন মানে আছে, সেসবই জগতের সকল স্বঅনুপ্রাণিত এবং সমন্বিত কাজের মূলে নিহিত।[৭১]

কেমন ছিল উমার ﵁-এর কন্ট্রোল প্রসেস?

উমার ﵁ কোনো ম্যানেজমেন্ট স্কুলে যাননি; কিন্তু তার শিক্ষা, প্রজ্ঞা এবং বিশেষ করে নবিজির সঙ্গ সবকিছু তাকে ম্যানেজমেন্টের একজন গুরুই বানিয়ে দিয়েছিল। তিনি নেতা নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট বিধি অনুসরণ করতেন।[৭২] উমার ﵁-এর গভর্নর এবং জেনারেলদের কিছু সাধারণ নির্দেশনা দিতেন এবং তিনি নিজে নিশ্চিত করতেন যে, তারা সেগুলো মেনে চলছেন। একইসঙ্গে তাদের নিজেদের কাজগুলো নিজেদের মতো করে পরিচালনা করার স্বাধীনতাটাটুকুও দিতেন। আবার যারা মনে করতেন যে, তাদের কাজের চাপটা একটু বেশিই, উমার তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ দিয়ে দিতেন।

নেতাকে সময়ে সময়ে তার অধীনদের দেখতে হবে যে, তারা কাজগুলো যথাযথভাবে করছেন কিনা। উমার ﵁ একবার সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আমি যদি তোমাদের মধ্যে যাকে আমি সবচেয়ে ভালো মনে করি তাকে তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার জন্য বেছে নিই, তাহলে কেমন হয়? তোমরা কি মনে করো যে, আমার দায়িত্ব শেষ? সবাই বলল, হ্যাঁ। উমার ﵁ জবাবে বললেন, না, আমার দায়িত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত শেষ হচ্ছে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি দেখে নিই যে, যাকে আমি দায়িত্ব দিয়েছি, সে তার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছে কিনা।

এই উক্তিটা প্রমাণ করে যে, উমার ﵁ কন্ট্রোল প্রসেস সম্বন্ধে ভালোভাবে জানতেন। এই উক্তি অনুযায়ী উমারের পয়লা কাজ হলো দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার কাজ বুঝিয়ে দেওয়া। তারপর উমারকেই তদারক করতে হবে সে তার কাজ বরাবর করছে কিনা। এই তদারকির কাজটা করার জন্য উমার ﵁ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন

---

[৭১] হাইকাল, এম. এইচ., আল-ফারুকু উমার, দার আল-মা'আরিফ, কায়রো, পৃ. ৩৫, (১৯৪৪)

[৭২] Ibid. পৃ. ৪২

আরও ভালো কোনো আদর্শ পাওয়া যাবে, তখন সেটাই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

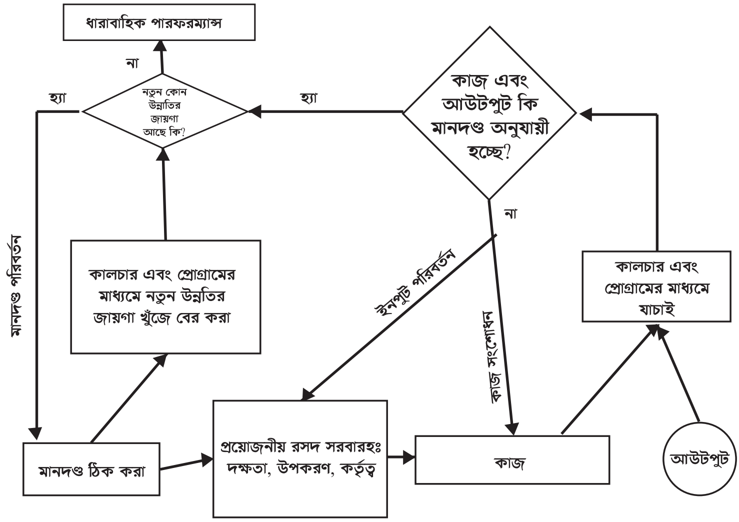
ধারাবাহিক পারফরম্যান্স
না
হ্যা
নতুন কোন উন্নতির জায়গা আছে কি?
হ্যা
কাজ এবং আউটপুট কি মানদণ্ড অনুযায়ী হচ্ছে?
না
মানদণ্ড পরিবর্তন
কালচার এবং প্রোগ্রামের মাধ্যমে নতুন উন্নতির জায়গা খুঁজে বের করা
ইনপুট পরিবর্তন
কাজ সংশোধন
কালচার এবং প্রোগ্রামের মাধ্যমে যাচাই
মানদণ্ড ঠিক করা
প্রয়োজনীয় রসদ সরবারহঃ দক্ষতা, উপকরণ, কর্তৃত্ব
কাজ
আউটপুট

চিত্র ৮: উমার ﷺ কর্তৃক অনুসৃত কন্ট্রোল প্রসেস

এই কন্ট্রোল মডেলটা চিত্র ৮-এ দেখানো হয়েছে।

উমার ﷺ এবং তার প্রশাসনিক উদ্ভাবনসমূহ:

প্রশাসন বলতে কী বুঝাতে চাচ্ছি, আগে সেটা বলে নেই। প্রশাসন হলো একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য যে কাজগুলো করা হয়, তা ঠিক মতো হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করার জন্য নিয়োজিত বডি।[৭৩] উদ্ভাবন তখনই ঘটে, যখন একটা প্রতিষ্ঠান এমন কিছু শিখে, যা সে আগে জানত না এবং পরবর্তী সময়ে সে কাজটা এমনভাবে করার পরিকল্পনা করে, যাতে তা আরও টেকসই হয়। অথবা সে শিখে যে আগে সে কোনো একটা কাজ যেভাবে করত, সেভাবে করা ঠিক নয় সেটা করা একদমই ঠিক নয়।[৭৪] আইডিয়াটা কোত্থেকে এসেছে সেটা ব্যাপার না, ব্যাপার

---

[৭৩] স্টোনার এন্ড ফ্রিম্যান, ম্যানেজমেন্ট, ৫ম সংস্করণ, প্রেন্টিস হল, নিউ জার্সি, পৃ. ৬৫৫ (১৯৯২)

[৭৪] ডিলওরথ, জে. বি. প্রোডাকশন এন্ড অপারেশন ম্যানেজমেন্ট, পঞ্চম সংস্করণ, ম্যাকগ্র হিল,

হলো আইডিয়াটা ফার্মের জন্য নতুন কিনা। উদ্ভাবন নিয়ে অসংখ্য লেখাজোকা আছে। একেবারে মৌলিক যে বিষয়গুলো উদ্ভাবনকে সহজ করে, সেগুলো হলো, সংস্কৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, নেতৃত্ব এবং পরিবেশ। সাহাবাদের কালচার ছিল উদ্ভাবনের জন্য একেবারে যথার্থ। উদ্ভাবনের পথে কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন তারা হননি। প্রাতিষ্ঠানিক কোনো স্ট্যাটাসকুও উদ্ভাবনকে দমিয়ে রাখেনি। প্রতিষ্ঠানের কাঠামোটা ছিল অযান্ত্রিক বা অরগ্যানিক। এ ছাড়া সাহাবারা উম্মাহর কল্যাণ চিন্তায় ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। তারা স্বপ্রণোদিত ছিলেন উম্মাহর কল্যাণ এবং উন্নতির ব্যাপারে। এই আন্তরিকতাই তাদের রসদ যুগিয়েছিল বর্ধিত উম্মাহর নিত্যনতুন সমস্যাগুলোর সমাধান পেতে। উমার ﵁ এসব কাজে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। তা ছাড়া উমারের নিজস্ব গুণাবলিও ক্রমাগত উন্নতির পথে মুখ্য ভূমিকা রেখেছিল। উমারের দূরদৃষ্টি, নেতৃত্ব, সাহসিকতা নতুন আইডিয়াগুলো বাস্তবায়নের জন্য আবশ্যক ছিল।

নবিজির সময়কার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছিল খুব সাধারণ। নবিজির হাতে ছিল নিরঙ্কুশ আদেশ প্রদান ক্ষমতা, আর ছিল সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। নবিজির একটা ১৪ সদস্যের শুরা বা পরামর্শ কাউন্সিল ছিল। যার সাতজন ছিলেন মাক্কা আর বাকি সাতজন মাদীনা থেকে; কিন্তু পরামর্শের পরিসীমায় সবাই যুক্ত ছিলেন। নবিজিও পুরো মুসলিম ভূমিকে প্রশাসনিক দিক থেকে ছোট ছোট রাজ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। নবিজির নিজস্ব কয়েকজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছিলেন। একজন সিল মারার কাজ করতেন, একজন বিশেষ কবিও ছিলেন, যিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে লিখিত কবিতাগুলোর জবাব দিতেন; কিন্তু এরা কোনো প্রতিষ্ঠান বা অধিদপ্তরের অধীনে ছিলেন না, ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত। যাহোক মোদ্দাকথা হলো, আসলে নবিজির সময়েই প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতিটা গড়ে ওঠে এবং এর উন্নতির বীজটাও সেসময়েই বপন হয়।

আবু বাক্‌র খলিফা ছিলেন ২ বছরের একটু বেশি। এই অল্প সময়ের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই তিনি ব্যাস্ত ছিলেন মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। তার প্রশাসনিক অবকাঠামো উন্নয়নে তিনি মনোযোগ দিতে পারেননি অতটা। একজন কোষাধ্যাক্ষ নিয়োগ, একজন বিচারক নিয়োগ এবং নবিজির সময়ের চেয়ে ভিন্নভাবে ভূ-তাত্ত্বিক বিভক্তিকরণ। সামান্য হলেও তার পদক্ষেপগুলো পরবর্তী সময়ের জন্য

পৃ. ৩৪৬, (১৯৯৩)

বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ এখান থেকেই ভবিষ্যতের শক্ত ভিত নির্মিত হয়েছিল।

প্রথম সরকারি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উমার رضي الله عنه-এর সময়ে। এই অধিদপ্তরগুলোকে বলা হতো দাওয়ায়িন (দিওয়ান-এর বহুবচন)। মুসলিম সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তারের সঙ্গে উমার সাহাবাদের পরামর্শ নিয়েছিলেন কীভাবে আরও ভালোভাবে মুসলিম খিলাফাত পরিচালনা করা যায়। নানা ধরনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল, শেষমেশ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বা অধিদপ্তর খোলার ব্যাপারে পরামর্শ গৃহীত হয়েছিল। যেমন: সেনা অধিদপ্তর, বেতনভাতা সংক্রান্ত অধিদপ্তর। বেতনভাতা সংক্রান্ত অধিদপ্তর সব নাগরিকের একটা তালিকা রেখেছিল, তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর তালিকা যাচাই করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও সরবরাহ করা হয়েছিল। এ ছাড়াও দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের জন্য ছিল আলাদা অধিদপ্তর। আত-তামাউয়ির বর্ণনা অনুযায়ী দামেশক, ইরাক এবং মিশরের ডিপার্টমেন্টগুলো স্থানীয় ভাষায় (রোমান, পারস্য) পরিচালনা করা হতো। যার অর্থ এসব অধিদপ্তরের কর্মচারীরা আরব ছিলেন না।[৭৫]

উমার رضي الله عنه কুফা এবং বসরা দুটি শহরও নির্মাণ করেছিলেন। এর কারণ ছিল ইরাকের অন্যান্য শহরগুলোর আবহাওয়া আরবদের জন্য স্বাস্থ্যকর ছিল না; একই সঙ্গে তারা এ ধরনের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন না। সৈন্যরা যাতে তাদের স্বাভাবিক জীবনধারা অব্যাহত রাখতে পারেন, উমার সেটাও চাচ্ছিলেন। উমার চাচ্ছিলেন যাতে সৈন্যরা নিজেদের সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগের যে স্বভাব লালন করেন, তা যেন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারে। অনেকটা আধুনিক সময়কার সেনাঘাঁটির মতো।

উমারকে প্রথমে আবু বাক্‌র رضي الله عنه মুসলিমদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ করেন। বিচারকের দায়িত্ব সফলভাবে শেষ করার পর উমার হন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা। নিজে নির্বাহী ক্ষমতা লাভের পর তিনি আলিকে বিচারক হিসেবে নিয়োগ করেন। এ ছাড়াও তিনি অন্যান্য রাজ্যগুলোতেও আলাদা আলাদা বিচারক নিয়োগ করেন। এই বিচারকেরা গভর্নরদের থেকে একদম স্বাধীন ছিলেন। তা ছাড়া উমার বিচারের জন্য একটা আইনগত নির্দেশিকাও প্রণয়ন করেন। এই নির্দেশিকায় বিচার করার সব মৌলিক নির্দেশনা এবং বিধিমালা লিখিত ছিল।

---

[৭৫] আত-তামাওয়ি, *উমার এন্ড দ্য ফান্ডামেন্টালস অব মডার্ন পলিটিক্স এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন*, দার আল-ফিকর, পৃ. ২৭০ কায়রো (১৯৭৬)

খলিফা উমারের প্রশাসনের আরেকটা উল্লেখযোগ্য দক্ষতা ছিল তথ্য সংগ্রহকরণে। বিশেষ করে শত্রুপক্ষের তথ্য সংগ্রহের কাজে। উমারের দৃষ্টিশক্তি এতটা প্রখর ছিল তিনি শত্রুদের প্রতারণা খুব সহজে ধরে ফেলতে পারতেন।

নিজের লোকজনের শক্তিমত্তার ব্যাপারে উমার رضي الله عنه সচেতন ছিলেন। তাদের শক্তিমত্তার পিছনে ছিল তাদের বিশ্বাসের সংস্কৃতি, ন্যায়বিচার, উদারতা এবং সাহস। একইসঙ্গে উমার তাদের দুর্বলতার কথাও জানতেন। যেমন: তিনি জানতেন যেসব সৈন্যরা মরুভূমি থেকে এসেছেন, তাদের সমুদ্রে নিয়ে তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। তাই উমার তাদের সামুদ্রিক যুদ্ধ অভিযানগুলোতে পাঠাতেন না।

কন্ট্রোল প্রসেস, নিয়ত উন্নতি চেষ্টায় তাঁর আন্তরিক অবদান এবং অংশগ্রহণমূলক কালচার এসব কিছু মিলে উমার رضي الله عنه ছিলেন একজন অপূর্ব ম্যানেজমেন্ট লিডার।

তার এই ম্যানেজমেন্ট কৌশলের অনুস্মরণে এই উম্মাহ আবারও সেই সোনালী দিন ফিরিয়ে আনবে এই কামনায় আমাদের এই বইটি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহই একমাত্র তাওফিকদাতা। তিনি এই বই থেকে আমাদের উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন, আর ভুলত্রুটি ক্ষমা করে দিন।

NOTE...
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....